ইসলামী খিলাফত ও আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব[1]

আব্দুল্লাহ বিন বশির

(শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা., পাঠানটুলি, নারায়নগঞ্জ)

'ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা'; মুসলামনের উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত যতগুলো ফরজ বিধান আছে তার মাঝে অন্যতম একটি হলো ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা। যা নববী যুগ থেকে নিয়ে উসমানী সালতানাতের বিলুপ্তি পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে জারি ছিলো। এই প্রবন্ধে আমি ইতিহাসের দর্পনে এই কথাটি বলার চেষ্টা করবো বর্তমান যত মুসলিম রাষ্ট্র আছে সেগুলোক কোনো অর্থেই ইসলামি খিলাফাহ বা ইসলামি শাসন বলার অধিকার রাখেনা। এবং পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম ইসলামি খিলাফাহ বা ইসলামি শাসনের দর্শনের আলোকে শাসন সংক্রান্ত যে মাসআলাগুলো বলেছেন সেগুলোকে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের সাথে খাপখাইয়ে উভয়কে একই আলোকে সাজানো সম্পূর্ণ ভূল।

প্রবন্ধটি আমি চারটি ভাগে বিভক্ত করবো।

১. খিলাফতের পরিচয় ও খিলাফতশাসন ও আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি মৌলিক পার্থক্য।

২. ইসলামের ইতিহাসে খিলাফতের পরম্পরার গুরুত্ব। এর আলোকে ইসলামি ইতিহাসে শাসনব্যবস্থা অধ্যায়নের সঠিক পন্থা জানা যাবে।

৩. ইসলামি খেলাফতের স্তর বিন্যাস।

---

[1]প্রবন্ধটির মূল উপাদন নেওয়া হয়েছে ড. যাহেদ সিদ্দিক মোঘল সাহেবের প্রবন্ধ 'ইসলামি খিলাফত আউর মাওজুদা মুসলিম রেয়াসাতো কা তারিখি তানাজুর ম্যে মুয়াজানা'। প্রবন্ধটি মূলত লেখকের একটি বয়ান সংকলন যা পরবর্তীতে ইসলাম ইয়া জমহুরিয়্যাত কিতাব ছাপা হয়। মূল প্রবন্ধের বিষয় ঠিক রেখে কথাগুলোকে আমি নিজের মত সাজিয়েছি ও বিভিন্ন দলিল আলোকে বিষয়গুলোকে আরো বোধগম্য করে লেখেছি। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ততার কারনে পত্রিকায় দলিলগুলো অনুল্লেখ রাখা হয়েছে। -আব্দুল্লাহ

৪. বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামি খিলাফতের মাঝে মৌলিক পার্থক্য বর্ণনা করবো।

[১] ইসলামি খিলাফত কী? সহজ করে বললে, মানুষের দ্বীন ও দুনিয়াবি যাবতীয় যত বিষয় আছে সেগুলো পরিচালনার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নির্ধারন করেছেন, সেগুলোকে তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে জীবনের পরিচালনার জন্য নির্ধারন করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠিক করে দেয়া নীতি ও নৈতিকতার প্রতিনিধিত্ব হয়ে জীবনপরিচালনার নামই হলো খিলাফত। শরহে মাকাসেদ গ্রন্থে খিলাফতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে,

هي رياسة عامة في الدين و الدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মুসলমানদের ইহলৌকিক বা পরলৌকিক বিষয়ে পরিচলনার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে খিলাফত বলে।

অর্থাৎ, মানুষের জীবনের যত অনুষঙ্গ আছে চাই তা ইহকালিন হোক বা পরকালিন; সকল বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত দাতা হলেন আল্লাহ ও তার রাসুল। আর আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতিনিধি হয়ে মানুষের এই সকলের বিষয়ের দায়িত্ব নেওয়াই হলো খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়া।

সংজ্ঞা থেকেই ইসলামি খিলাফতের মৌলিকত্ব ও আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে একজন শাসক হন মূলত জনগণের প্রতিনিধি। জনগণের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ও কামনানবাসনা নিশ্চিত করাই হয় একজন শাসকের কাজ। ইসলামি খিলাফত ও গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বের এই মৌলিকত্বের বিষয়টি বুঝা অত্যান্ত জরুরি। ইসলামি খিলাফতে একজন শাসকের তখনই বিরোধিতা করা যায়, যখন শাসক আল্লাহর নাফরমানির কোনো আদেশ করে। কারণ

নাফরমানির আদেশের অর্থই হলো শাসক সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে না। আর জনগণের মূল শাসক যেহেতু খলিফা বা বাদশাহ নয়, বরং আল্লাহ। তাই আসল শাসকের বিরোধিতা করার কারণে দুনিয়ার শাসকের আদেশ মানার কার্যকরিতা শেষ হয়ে গেছে। অপরদিকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন মানুষ তখনই শাসকের বিরোধিতা করার আইনত অধিকার রাখে, যখন শাসকের কোনো আইন বা আদেশ জনগণের চাহিদা বা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হয়।

আরেকটি বিষয় হলো, দুনিয়ার যেকোনো রাষ্ট্রে যখন কোনো আইন পাশ করা হয় তখন সে আইনের পক্ষে রেফারেন্স উল্লেখ করতে হয়—কোন উৎসের ভিত্তিতে আমি এই আইনটি প্রণয়ন করতে চাচ্ছি। ইসলামি খিলাফত ও গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বের মৌলিক পার্থক্যের কারনে এখানেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। একটি ইসলামি খিলাফতে যখন কোনো আইন পাশ নিয়ে আলোচনা হয় তখন তা বাস্তবায়ন করার জন্য রেফারেন্স ব্যবহার হয় কুরআন-সুন্নাহ ও তার আলোকে তৈরি মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত। আর গণতন্ত্রে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার হয় মানবীয় চাহিদা ও স্বাধীনতা, যা সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কখনো যদি কোনো ইসলামি আইন বাস্তবায়ন হয় তা এজন্য নয় যে, এটা কুরআন ও সুন্নাহতে আছে। বরং তা এজন্য যে এটা জনগণ চেয়েছে। যদি জনগণ না চাইতো তাহলে এটা আল্লাহ বললেও বাস্তবায়ন হবে না।[2]

এই মৌলিক পার্থক্যটি সঠিক অনুধাবন করতে না পারার কারণে অনেকেই গণতন্ত্রের মাঝে কোনো ইসলামি বিধান দেখলে বিশ্বাস করে বসেন, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েও ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব। যা নিতান্ত ভুল ও একটি

---

2. বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুফতি তাকি উসমানি দা.বা. লেখিত 'হাকিমুল উম্মত কে সিয়াসি আফকার' পৃ. ১৮, প্রকাশন, ইদারাতুল মাআরিফ, করচি। (বইটির একটি অনুবাদ ছেপেছে পূনরায় প্রকাশন থেকে 'রাষ্ট্র রাজনীতি ও ইসলাম' নামে।

জাহালাতপূর্ন ধারণা। খিলাফত ও আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য নিয়ে সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ

[২] ইসলামি ইতিহাসে খিলাফতের পরম্পরার গুরুত্ব।

বিশ্বব্যাপি পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসানে মুসলমানরা সবচেয়ে বড় মনস্তাত্বিক যে গোমরাহির স্বীকার হয়েছে তারমধ্যে একটি হলো গনতন্ত্রের দাঁড়ি পাল্লায় ইসলামি খিলাফতকে যাচাই করা। যখন ইসলামি খিলাফাতের ইতিহাসকে এই দাঁড়ি পাল্লায় মাপা হলো, তখন আধুনিক চিন্তাবিদরা অদ্ভুত সব ফলাফল বের করা শুরু করলো। ইসলামের কোনো বিধান বা কোনো চিন্তার সামান্যতম অংশও যদি গণতন্ত্রের সাথে মিলে যায় তাহলে সেগুলোকে এমনভাবে পেশ করে যেন গণতন্ত্র আর ইসলাম দুটো একই বিষয়। আর যেগুলো মিলে না, হয় সেগুলোর মূলকেই অস্বীকার করে বসে থাকে, অথবা সেচ্ছাচারি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে মূল বিধানের বিকৃতি সাধন করে ফেলে।

এই চিন্তাবিদদের একটি অংশের নিকট খিলাফতে রাশেদার পরে সমস্ত ইসলামি ইতিহাস অনৈসলামি মনে হয়। এবং সেটাকে বদনাম করার জন্যে তারা 'মুলুকিয়্যাত (রাজতন্ত্র) খিলাফতের বিপরীত' এই চিন্তার আবিষ্কার করলো। 'খিলাফত' ও 'রাজতন্ত্রের' এই পার্থক্য ইসলামি জ্ঞান-ভাণ্ডারের একদম সম্পূর্ণ আজনবি ও অপরিচিত। বিংশশতাব্দীর পূর্বে কোনো ইসলামি গবেষক মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদ এই ধারনা পেশ করেননি। ইমাম মাওয়ারদি ও ইবনে খালদুন রহ. থেকে নিয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. পর্যন্ত সকল ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তকগণ ইসলামি খিলাফতকে 'খিলাফতের বিভিন্ন স্তরবিন্যাসের' দর্শনে লেখেছেন। এর একটি অন্যতম বড় দলিল হলো, খলিফা নির্বাচনের সুন্নাহ সম্মতি পদ্ধতি তো হলো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের মাধ্যমে খলিফা নির্ধারন করা হবে অথবা পূর্ববর্তী খলিফা পরিবর্তী খলিফা নিয়োগ দিয়ে যাবে। এই সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি ছাড়াও কেউ যদি শক্তির প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করে

নেয় এবং সে ইসলামি বিধাননুযায়ী খিলাফতের কাজ পরিচালনা করে তাহলে তার খিলাফতও মেনে নিতে হবে বলে ফকিহ স্পষ্ট বলেছেন। ইবনুল জামাআ রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

وأما الطريق الثالث، الذي تنعقد به البيعة القهرية: فهو قهر صاحب الشوكة، فإذا خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو من أهلها، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، **انعقدت بيعته، ولزمت طاعته، لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم. ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو فاسقا في الأصح. وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة** لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده، انعزل الأول وصار الثاني إماما. (تحرير الأحكام الباب الأول: في وجوب الإمامة ص ٢٥٩، مكتبة دار المنهاج)

এছাড়া শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবি রহিমাহুল্লাহ তার জগৎবিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইজালাতুল খফাতে’ খিলাফতকে দুভাবে বিভক্ত করেছে। ১. খিলাফতে খাসসাহ। ২. খিলাফতে আম্মাহ। খিলাফতে খাসসাহ হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদিনের খেলাফত এবং খিলাফতে আম্মাহ হলো উনাদের পরবর্তী যুগের খিলাফত। যেগুলো মৌলিকভাবে ইসলামের বিধিবিধানমতেই শাসনের কাজ পরিচালনা করেছেন এবং কিছু বিষয়ে জুলুম ও শরীয়তের বিধানও লঙ্গন করেছেন। (দেখুন, ইজলাতুল খফা ৩/২৮৩, আলফাসলুস সাবে’, আদদালিলুল আকলিয়্যি আলা খিলাফাতিল খুলাফা)

তাফতাজানি রহিমাহুল্লাহ তো এটাও বলেছেন উম্মাতের আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সকলেই খিলাফতে রাশেদা পরবর্তী শাসকদেরকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃত দিয়েছেন। তিনি লেখেন,

فمعاوية رصي الله عنه و من بعده لا يكون خلفاء، بل ملوكا و أمراء، وهذا مشكل، لأن أهل الحل والعقد من الأمة كانوا متفقين على خلافة الخلافة العباسية.... (شرح العقائد ص ٣٥٢، مكتبة البشرى)

আধুনিক এই চিন্তাবিদরা তাদের এই বিশ্লেষনে নিজেদের জন্যে পূর্বেই একটি অবশ্যকীয় ফলাফল নির্ধারন করে নিয়েছেন। আর তা হলো-'রাজতন্ত্র অত্যান্ত খারাপ ও অনৈসলামিক একটি শাসনব্যবস্থা। আর ইসলামি খিলাফতব্যবস্থা মূলত গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথেই বেশি সামঞ্জস্যশীল'। নিজেদের নির্ধারিত ফলাফলের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাদের ধারণা এতটাই অকাট্য যে- নিজেদের পক্ষে শরীয়তের কোনো একটি দলিল পেশ করার প্রয়োজনীয়তার অনুভব পর্যন্ত তারা করে না। শুধু চিন্তা-ভাবনা আর নিজস্ব গবেষনার জোরেই তারা এত বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । অথচ কুরআন ও হাদিসের কোথাও রাজতন্ত্রকে হারাম বলা হয়নি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে কুরআন মানুষের সামাজিক জীবনে সুদ এবং যিনার মত বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট ঘোষনা দিয়ে হারাম করেছে, সে কুরআন রাষ্ট্রচিন্তার সবচেয়ে বড় ধারণা 'রাজতন্ত্রে'র বিষয়ে একদম নিশ্চুপ! মজার কথা হলো, কুরআন থেকে রাজতন্ত্র হারামের পক্ষে কোনো দলিল দেওয়া তো অনেক দূরের বিষয় স্বয়ং কুরআনে রাজতন্ত্রের পক্ষে দলিল পাওয়া যায়। যেমন কুরআনে বিভিন্ন নবীদের ঘটনা পাওয়া যায় যারা নিজ বংশে ক্ষমতা থাকার দোয়া করেছেন আর আল্লাহ তাঁদেরকে এই ধরনের দোয়া করতে নিষেধ করেননি। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই আধুনিক চিন্তাবিধরাও কিন্তু দ্বিমুখী বক্তব্য দিয়ে থাকে। তাদেরকে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-র ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা বলে এটা খিলাফতে রাশেদার নমুনা। অথচ এই নমুনাও কিন্তু মূলত রাজতন্ত্রই ছিলো। চিন্তার বিষয় হলো, গণতন্ত্রকে এরা এতটাই উন্নত শাসনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে যে, গণতন্ত্রের আলোকে

ইসলামি গণতন্ত্র বা ইসলামি জমহুরিয়্যাহ খুঁজে বেড়ায় আর রাজতন্ত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয় অনৈসলামি! অথচ গনতন্ত্রের পক্ষে না শরয়ী কোনো দলিল আছে, না খিলাফতে রাশেদায় এর কোনো নমুনা আছে। বরং রাজতন্ত্রের পক্ষে শরয়ী দলিলও আছে, খাইরুল কুরুনে এর উত্তম দৃষ্টান্তও রয়েছে। এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তক ইমামগনের নিকট রাজতন্ত্রের অনুমতিও আছে। ইদ্রিস কান্ধলবি রহ. বলেন, 'ইসলামের মধ্যে মৌলিকভাবে রাজতন্ত্রের অনুমতি রয়েছে। যারা বলের ইসলামে রাজতন্ত্রের অনুমতি নেই তাদের কথা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'[3]

মূল কথা হলো, রাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে অনৈসলামিক কোনো পদ্ধতি নয়। হাঁ, তা অনুসরণীয় পদ্ধতিও নয়। রাজতন্ত্র খারাপ হওয়ার মূল কারণ এটা নয় যে, এখানে বংশপরম্পরায় ক্ষমতা চলতে থাকে। বরং খারাপ হলো, তার ভুল ব্যবহার। আর এই কথা শুধু রাজতন্ত্রের জন্যেই নয় বরং যেকোনো শাসনব্যবস্থার জন্যেই প্রযোজ্য। আধুনিক যুগের চিন্তাবিদরা রাজতন্ত্রকে তুলনা করে স্বৈরাশাসনের সাথে। যেখানে শাসকের হুকুমই দেশের সংবিধান বলে গন্য হয় অর্থাৎ বিধান দেওয়ার অধিকার বাদশাহের। তাদের এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামি ইতিহাসে স্বৈরাশাসকের অস্থিত্ব থাকলেও তাদের কথাই একমাত্র আইন ও তারা যেকোনো বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত দিবে তাই পালনীয় এমন কোনো চিত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বরং রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো চলতো ধর্মীয় বিধিনিষেধনুযায়ী। যেখানে বাদশাহ নয় হাকিমিয়্যাত ছিলো আল্লাহর। এ বিষয়ে সামনে আরো কিছু আলোকপাত করা হবে। কিন্তু তার পূর্বে কিছু বিষয়ের ফলাফল বের করে নেওয়া উচিত। যদি আমরা ধরে নেই যে, রাজতন্ত্র একটি অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থা আর খিলাফতে রাশেদার পরপরই এই অনৈসলামিক

---

[3]. দস্তুরে ইসলাম পৃ. ৭৯, মাকতবায়ে উসমানিয়া, লাহোর

শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাহলে আমাদের অনেকগুলো আবশ্যকীয় ফলাফলও মেনে নিতে হবে।

১. আমাদের এটা মেনে নিতে হবে ইসলামী শাসনব্যবস্থার আয়ু মাত্র ত্রিশবছর।

২. সুতরাং আমাদের দ্বারা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর যদি সম্ভবও হয় তাহলে আমাদের পক্ষে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মত মহান ব্যক্তিরাই ত্রিশ বছরের বেশি তা টিকিয়ে রাখতে পারেনি সেখানে আমাদের মত দূর্বল ইমানের অধিকারীদের অবস্থান কোথায়!?

৩. ইসলাম যেখানে ত্রিশ বছরের পর অতিতের মানুষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি সেখানে আধুনিক যুগের জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে? আধুনিক যুগে ইসলামের সকল কর্মকাণ্ডের সম্ভবনা নির্ভর করে অতীতে তা কতটুকু সফল হয়েছে তার উপর। যদি ইসলামের ইতিহাসে ব্যর্থতার কলঙ্ক লেগে যায় তাহলে অমুসলিমদের এই কথা বলার অধিকার হয়ে যাবে যে, ইসলামের সেই প্রভাবনী শক্তি নেই যার মাধ্যমে নিজ অনুসারীদের জীবনে পরিবর্তন আনবে।

৪. ইসলামের ইতিহাসে নিকট ও দূর অতিতে যারা হকের উপর অবিচল থেকে ইসলামকে রক্ষা করেছে, তাঁদের জীবনী ও কর্মকাণ্ডকে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে এমন ঐতিহাসিক করে উপস্থাপন না করার অর্থ হলো- যারা বর্তমানে হকের উপর চলতে চায় তাদেরকে এই বার্তা দেওয়া যে- ইসলাম একটি মৃত তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। যা দূরঅতিতেই দুনিয়া থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে। এখন তা শুধু মাত্র বইয়ের পাতায় আছে, বর্তমানে এর প্রায়োগিক রুপ দেখানো অসম্ভব। সাথে এটাও প্রমানিত হবে ইসলামে অনুসরণীয় ও সোনালী কোনো সভ্যতা নেই। আছে শুধু অস্পষ্ট কাল্পনিক কিছু মোটা কথা যার সাথে মানুষের যাপিত জীবনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

৫. এটাও মেনে নিতে হবে পুরো ইসলামের ইতিহাসে যত মুফাসসিরিন, মুহাদ্দিসিন, ফুকাহা ও সুফিয়ায়ে কেরাম এমনকি যত মুজাদ্দিদিন দুনিয়ায় এসেছে সকলেই একটি জাহেলি জীবনব্যবস্থার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

৬. সবচেয়ে বড় কথা যদি এই কথা মেনে নেওয়া হয় যে- খিলাফতের পরেই রাজতন্ত্র নামের একটি জাহিলি জীবনব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে তাহলে তার প্রতিষ্ঠা ও সে অনুপাতে জীবন চালানোর অপবাদ সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামের উপর আসে। কারণ রাজতন্ত্রের ধারণা সাহাবা যুগ থেকেই শুরু হয়েছে এবং একদল সাহাবা এতে কোনো আপত্তি করেনি। সাহাবাগণের একটি অংশ অনিসলামি শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছে! (নাউজুবিল্লাহ)

কেউ যদি এই সমস্ত ফলাফলগুলো মেনে নেয়, তাহলে প্রথমে তাকে পুরো ইসলামের ইতিহাসকে জাহিলিয়্যাতের কলঙ্ক দিতে হবে। কিন্তু কোনো মুমিনের জন্যে এটা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ সাহাবায়ে কেরামের শানে এমন জঘণ্য অপবাদ দেওয়া নিজের ইমান ধ্বংস করারই নামান্তর।

ইসলামের ইতিহাসকে অপবাদ দিতে 'শতভাগের দর্শনের' একটি মনগড়া দর্শন তৈরি করা হয়। এই দর্শনের আলোকে তারা খিলাফতে রাশেদা পরবর্তী রাজতন্ত্রের বিভিন্ন ত্রুটিকে সামনে এনে এটা প্রমাণ করতে চায় রাজতন্ত্রে তো শতভাগ ইসলাম ছিলো না, তাই এগুলো অনিসলামি। অথচ বাস্তবতা হলো কোনো বিষয় শতভাগ ইসলামি না হলেই যে তা অনিসলামি হয়ে যায় না। তাহলে 'শতভাগের দর্শন'-র প্রপাগাণ্ডা দিয়ে কেনো রাজতন্ত্রের উপরই আক্রমণ করা হয়? এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের এখানে একটি প্রশ্ন করা অতিরঞ্জন হবেনা- তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ যদি কখনো কোনো ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হয়ও, তা কি 'শতভাগ দর্শনে'র খিলাফত হবে?

এই বুদ্ধিজীবীদের যখন আরেকটি প্রশ্ন করা হয়- আচ্ছা ইসলামি খিলাফত কী? তখন তারা খিলাফতের যে সমস্ত শর্তাবলি পেশ করে তার সবগুলোই রাজতন্ত্রের সময়গুলোর সাথে মিলে যায়। কিন্তু তারপরেও তারা রাজতন্ত্রকে খিলাফত স্বীকার না করে গো-ধরে বসে থাকে। তাদের এই পরস্পর বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার পিছনে মৌলিক তিনটি কারণ দেখা যায়।

১. ইসলামি শাসননীতি নিয়ে আলোচনার প্রক্কালে এই বুদ্ধিজীবীরা পূর্ববর্তী মনীষাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গনতান্ত্রের দর্শন দিয়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার পরিভাষাগুলো বর্ণনা করবে। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের যেকোনো বই খুলে দেখুন, তাদের যে মূল দর্শন 'ইসলামি গনতন্ত্র' তার স্বপক্ষে কোনো পূর্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তকদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি তারা দিচ্ছেনা। কারণ তারা তো এই দর্শন ফারাবি, জনলাক ও রুসো ইত্যাদী পশ্চিমাদের থেকে ধার করে নিয়েছে। ইসলামি জ্ঞান-ভাণ্ডারে যার পূর্ব কোনো অস্থিত্ব নেয়।

২. শাসনব্যবস্থা ও শাসনক্ষমতার পরিবর্তনকে এক অর্থে ধরে নেওয়া। অথচ শাসনক্ষমতার পরিবর্তনরীতি হলো শাসনব্যবস্থার (সার্বিক ক্ষমতার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার) সামান্য অংশ। পূর্ণ শাসনব্যবস্থা তো পরিবার থেকে নিয়ে একদম রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যেখানে শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্কের সীমারেখা, অনুশাসন, বিচার-ফয়সালা এবং অর্থব্যবস্থা, তা কার্যকরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রগুলোতে আসল সমস্যা যেটা হয়েছিলো-'আহলুর রায়'র সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচনের যে সুন্নাহ পদ্ধতি তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শাসনব্যবস্থা আর শাসনক্ষমতার এই পার্থক্য না ধরতে পারার কারণে খিলাফতে রাশেদার পরে শাসনব্যবস্থায় যে সামন্য পরিবর্তন এসেছে তাকে নব্য বুদ্ধিজীবীরা 'ইসলামি রাষ্ট্রশাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে' এই মতে ব্যক্ত করেছে।

শাসনব্যবস্থা আর শাসনক্ষমতার পার্থক্য আমাদের খুব ভাল করে বুঝা দরকার, বর্তমানে এই পার্থক্য সঠিকভাবে না বুঝার কারণে ইসলামি শাসননীতি নিয়ে লেখা গবেষগণ বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছুতির শিকার হন। এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বলি, গণতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা। এখানে অর্থনীতি কীভাবে কাজ করবে, প্রশাসন কোন মূলনীতি সামনে রেখে কাজ করবে, পরারাষ্ট্রনীতি কী হবে, রাষ্ট্রের আইন ও তার প্রয়োগ, ফৌজদারি বিধান ইত্যাদি সকল বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। আর এরমাঝে একটি অংশ হলো গণতান্ত্রিক শাসকব্যবস্থায় ক্ষমতার পালাবদল কীভাবে হবে। এর সমাধান গণতন্ত্র দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন মাধ্যমে। এই নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি ক্ষমতার পালাবদলের অংশ। যার কারণে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয় শাসনব্যবস্থার নয়। রিপাবলিক থেকে ডেমোক্রেটিক ক্ষমতায় আসে, আওমীলীগ থেকে বিএনপি আসে, কিন্তু শাসনব্যবস্থা থাকে অপরিবর্তনীয়। উসমানি খিলাফত ধ্বংসের আগে মৌলিকভাবে মুসলিমদের শাসন বিষয়ক যে পরিবর্তন এসেছে তা ছিলো শাসনক্ষমতার পরিবর্তন। মূল খিলাফত উমাইয়া থেকে আব্বাসি হয়ে উসমানি বা শায়ত্বশাসিত সেলজুক থেকে আইয়ুবি বা গজনি, সুলতানি থেকে মোঘল— এর সবটাই ছিলো শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন। শাসনব্যবস্থার নয়।

৩. শাসনব্যবস্থা আর ক্ষমতার দখলের পরিবর্তনের উপরো ক্ত পার্থক্য না বুঝার কারণে ইসলামি ইতিহাসের রাজতন্ত্রের খলিফাদের স্বৈরশাসক এবং শাসনপরিচালনায় সব বাঁধা মুক্ত ছিলেন এমনটা ধরে নেওয়া হয়েছে। শাসকগণ যদিও ক্ষমতায় একচ্ছত্র ছিলেন কিন্তু শাসন পরিচালনায় ওলামায়ে কেরাম, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ, সুলতান প্রথম সেলিম তখন উসমানী সম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায়। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড বাহাদুর ও কঠোর মেজাজের।

সেসময় স্পেনের খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর শুরু করে নির্মম অত্যাচার। সুলতান সেলিমের কাছে সে সংবাদ পৌঁছলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার সম্রাজ্যের খ্রিস্টানদেরকে মুসলিম হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ ব্যপকহারে হত্যা করবেন। কিন্তু শাইখুল ইসলাম আলি জাম্মালি তখন সুলতানকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করে ছাড়লেন।

এধরনের অসংখ্য উদাহরণ ইসলামি ইতিহাস থেকে দেওয়া যাবে। বস্তুত, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের বিলুপ ছিলো পশ্চিমাদের জন্য অত্যান্ত জরুরি। তাই তারা রাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের ঘৃণা তৈরি করতে একে এমন এক ঘৃণিত রূপ দিয়েছে যে, রাজতন্ত্র শব্দটি শুনলেই এক ভয়ংকর 'স্বৈরাশাসক'-এর চিত্র ভেসে উঠে।

বাস্তবতা হলো পশ্চিমের রাজতন্ত্রের বর্ণনায় আকা যে স্বৈরাশাসন মুসলিম ইতিহাসের এর অস্তিত্ব ছিলো না। কেননা, একজন মুসলিম শাসক বিভিন্ন গোত্রপ্রধান, বিচারপ্রতি, প্রদেশীক শাসক এবং বিশেষত, ওলামায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে কেরামকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলতে পারতো না। এবং সেসময় একজন শাসককে ক্ষমতা ঠিকিয়ে রাখার জন্যে ধর্মীয় বিষয়াদি বাস্তবায়ন ছাড়া বিকল্প কোনো পথ ছিলো না।

[৩] ইসলামি খিলাফতের স্তর বিন্যাস

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম মুসলিমদের রাজ্য শাসনের ইতিহাসকে 'খিলাফাত' ও 'রাজতন্ত্র' এই দুভাগে বিভক্ত করেনি। বরং 'খিলাফতের বিভিন্নস্তর রয়েছে' এই দর্শনে আলোচনা করেছেন। কারণ ইসলামে খিলাফত এবং শাসনব্যবস্থার মৌলিক দর্শন হলো- আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করা। অর্থাৎ, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র, জীবনের প্রতিটি স্তরের যত সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের মূল ভিত্তি হবে শরীয়ত প্রণেতার সন্তুষ্টি। একজন শাসক নিজেও এভাবে কার্য সম্পাদনা করবে এবং সাধারণ মানুষকেও এভাবে

চলতে বাধ্য করবে। বস্তুত মুমিনের যেমন স্তর রয়েছে তেমনি এই প্রতিনিধিত্বেরও স্তর রয়েছে। কিছু মুমিন যাদেরকে আমরা আবু বকর, ওমর বা সাহাবা রা. বলি তারা ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের। আর কিছু আছে তাদের থেকে আরো কম স্তরের। এভাবে দুর্বল ঈমানের অধিকারীও রয়েছে যাদের কেউতো কম স্তরের ফাসেক আর কেউ বড় পর্যায়ের। এত সব স্তরবিন্যাসের পরেও এই সকল শ্রেণির পরিচয় হলো তারা মুসলিম।

মূল তো হলো সাহাবাদের মত ইমান আনা। কিন্তু সে স্তর থেকে কম ঈমানদারকেও আমরা মুসলিম বৈ অন্যকিছু বলিনা। 'খিলাফত'ও সম্পূর্ণ এর অনুরূপ। খিলাফাতে রাশেদা হলো ইসলামি ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ের খিলাফত এবং তাই অনুসরনীয়। পরবর্তীতে খিলাফত বাকি থাকলেও খিলাফতে রাশেদার সমকক্ষ কিছুতেই নয়। এখন যদি কেউ বলে খিলাফতের একমাত্র অনূসরনীয় পন্থা যেহেতু খিলাফতে রাশেদা। আর পরবর্তী যুগগুলোতে তা থাকেনি। তাই সে সময়ের শাসন ব্যবস্থাকে 'খিলাফত' নামে অভিহিত করা যাবেনা। তাহলে এই ব্যক্তির কথা আর যে বলবে- 'সাহাবাদের মত ইমান না আনতে পারার কারণে কাউকে মুসলমান বলা যাবেনা' কথার নামান্তর।

'খিলাফতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে' এই দর্শনটি যুক্তির নিরিখেও বেশি শক্তিশালী। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র এই তিন বস্তুর উপরেই মূলত মানুষের জীবন। আর সেগুলোর অধপতনে তিনটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় থাকে।

১. জীবন ব্যবস্থার অধপতন হঠাত করে দেখা দেয়না। বরং ধীরে ধীরে তা পরিলক্ষিত হতে থাকে।

২. অধপতন কোনো দুর্ঘটনা বা অনাকাঙ্খিতভাবে হয়ে যায় না যে মানুষ হুট করে পুরোতন জীবন ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে নতুন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে

ফেলে। সাংস্কৃতি থেকে নিয়ে শিক্ষা, সামাজিক প্রতিটি ব্যবস্থার মাঝে অধপতনের অঙ্কুরন ধীরে ধীরে প্রকঠ হয়।

৩. অধপতন সোজা লাইন (Linear relation) নয় যে সর্বদা এক নাগাড়ে নীচের দিকে চলতে থাকবে। বরং সামগ্রিকভাবে অধপতনেরও জোয়ারভাটা হয়। কখনো খুব দ্রুত পরিলক্ষিত হয়, আর কখনো খুব ধীরে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ‘সর্বত্তম আমার যুগ। তারপর তার পরের যুগ এবং তারপর তার পরের যুগ’ থেকেও উপরোক্ত কথা ‘মুসলিমদের অধপতন আকস্মিক নয় বরং ধীরে ধীরে’ হবে প্রমান হয়। এখানে এই কথাটিও স্মরন রাখা দরকার যে, খিলাফতে রাশেদার পর মুসলিমদের অধপতন শুধু শাসনব্যবস্থা আর শাসনক্ষমতার মাঝেই সিমাবদ্ধ ছিলো না বরং ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনেও তা দেখা দেয়। আর এই ব্যক্তি ও সামাজিক অধপতনটি আমাদের দৃষ্টিতে ‘খিলাফতে রাশেদা’ থেকে শুধু ‘খিলাফত’ এই সুরতে প্রকাশিত হয়।

প্রতিটি রাষ্ট্রের দুটো মৌলিক বিষয় থাকে। ১. স্বরাষ্ট্রনীতি। ২. পরারাষ্ট্রনীতি। এই দুই নীতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যে প্রতিটি রাষ্ট্রই কিছু মৌলিক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করে। আর খিলাফতের অর্থ যেহেতু ‘আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করা’ সে হিসেবে খিলাফতেরও এই দুটো মৌলিক বিষয়ের রয়েছে মৌলিক কর্মপদ্ধতি।

১. স্বরাষ্ট্রনীতি হলো ‘দ্বীন প্রতিষ্ঠা’। ‘শরিয়া বাস্তবায়ন’, ‘আমর বিল মারুফ’ ও ‘নাহি আনিল মুনকার’-এর ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা তৈরি হবে তা হলো কর্মপদ্ধতি।
২. পরারাষ্ট্রনীতি হলো ‘আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা’। আর ‘জিহাদ’ ও ‘তাবলিগ’ -এর নীতির আলোকে যা বাস্তবায়ন করা হয়।

এই হিসেবে খিলাফতের স্তরবিন্যাস এপদ্ধতিতে হবে-

ক] খিলাফতে রাশেদা

আল্লাহর বান্দা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতাকে শুধু ইসলামের প্রতিষ্ঠা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আওয়াজ বুলন্দ করা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধে ব্যবহার করা, যেখানে নিজের ব্যক্তিস্বার্থের কোনো সামন্যতম কোনো অংশই থাকবেনা। শুধু তাই নয়, শরীয়তের অনুমদিত ক্ষমতাসীনদের জন্য বৈধ বিষয়াদিতেও সতর্কতা অবলম্ভন ও তাকওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা। খোলাফায়ে রাশেদীনের দুটো উদাহরণ থেকে বিষয়টি একদম পরিস্কার হয়ে যাবে। ক) ইসলামে খলিফা বা শাসকদের জন্য রাজস্ব ভাতা থেকে মধ্যম পর্যায়ের জীবিকার ব্যবস্থা থাকলেও খোলাফায়ে রাশেদীন শুধু প্রয়োজনটুকুই গ্রহণ করতেন আর বাকিটুকু বাইতুল মালে জমা রেখে দিতেন। খ) খলিফা বা শাসকদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়তে বৈধ। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন কখনোই নিজেদের জন্য এই বৈধ বিষয় গ্রহণ করেননি। অথচ তিনজন খলিফাকেই নির্মমভাবে শহিদ করা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা ও দ্বীনের বিষয়ে সর্বদা ছাড় এড়িয়ে সতর্কতা ও আজিমতের উপর তারা ছিলেন। একটি মুহুর্তের জন্যেও ক্ষমতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার তারা করেননি। আর এটাই খোলাফায়ে রাশেদীনদের অন্যান্য খলিফা থেকে আলাদা বৈশিষ্টে সমুজ্জল করে রাখে।

খ] সাধারণ খিলাফাত/ ইমারাত/ সম্রাজ্য

তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনের সমস্ত মৌলিক বিষয় বাস্তবায়ণ তথা, শরীয়া প্রতিষ্ঠা, জিহাদ মুসলিমদের জান-মাল রক্ষা করার সাথে সাথে ক্ষমতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা তথা ধন-সম্পদ অর্জন, নিজের নৈকট্যপ্রাপ্তদের ক্ষমতায় বসানো, গৌরব অর্জনের জন্য রাষ্ট্র দখল ও শহর প্রতিষ্ঠা করা, ক্ষমতা দীর্ঘায়িতি করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্ভন করা ইত্যাদি।

‘নিজ স্বার্থে ক্ষমতার ব্যবহার’ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে করে থাকে সে হিসেবে খিলাফাত/ইমারত বা সম্রাজ্য কয়েকভাবে বিভক্ত হবে।

১. ন্যায়পরায়ন শাসকদের হাতে পরিচালিত রাষ্ট্র

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাএর প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণার সাথে পরিচালনা করা। বাহ্যিকভাবে তার থেকে শরীয়তের বিরোধি কোনো কার্যকলাপ প্রকাশ না পাওয়া, কোনোরকম ফিসক বা অপকর্ম-অন্যায়ে তিনি লিপ্ত থাকেনা।। যদি কখনো তার পক্ষ থেকে কোনো গুনাহ বা জুলুম প্রকাশ হয়ে যায় তা তার সার্বক্ষণিক কোনো অভ্যাসে পরিনিত হয়না। তিনি বৈধ পন্থায় দুনিয়া উপভোগ করে থাকেন। এর উদাহরণ যেমন, খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক, আওরঙজিব আলমগীর ইত্যাদি মুসলিম ইতিহাসের বহু শাসক।

২. ইমারতে জাবেরাহ বা জালেম শাসকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র

ঐ সমস্ত শাসক যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে ত্রুটি করে থাকে। প্রকাশ্য জুলুম ও অন্যায় করে কোনোরূপ অনুতপ্ত হয়না এবং তাওবাও করতোনা। এতদাসত্ত্বেও শরীয়া বাস্তবায়ন ও ইসলামি শিয়ার সমুন্নত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

৩. ইমারাতে দল্লাহ বা গোমরাহ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র

চূড়ান্ত পর্যায়ের ফাসেক, বিলাসি ও মুসলিমদের উপর অত্যাচারী শাসক। যারা শুধু নিজেই অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয় না বরং সমাজে অন্যায় ও অপকর্ম ছড়িয়ে দিতে ব্যপক ব্যবস্থাপনা করে দেয়। মানুষের উপর অত্যাচার, অহংকার, অন্যায়ভাবে মুসলিমদের জানমাল ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা যার নিয়মিত আমলে পরিণত হয়।

৪. কাফের শাসকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র

তা এমন রাষ্ট্র যার শাসক কাফের অথবা কুফরি বিধিবিধান মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়। এমন শাসকরা নিজেদের তৈরি বিধান শরীয়তের উপর চাপিয়ে দেয়। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ও সেগুলর উপর বিভিন্ন আপতি তুলে। সমাজে নাস্তিকতা, ধর্মবিরোধীতা সূত্রপাত ঘটায় এবং সময়ে সময়ে ইসলামের শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করে থাকে।

এই প্রকারগুলো থেকে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, সমষ্টিগতভাবে আমাদের ইতিহাসে শাসনব্যবস্থা ইসলামি ছিলো, তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের শাসক এসেছে। এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই ইতিহাসে মুসলিমদের অনেক খারাপ অধ্যায়ও আছে, পুরো মুসলিম উম্মাহের সকলে ফেরেশতা তূল্য নয়, মানুষ হিসেবে তাদের থেকে ভুল ত্রুটি ও অন্যায় হয়েছে, এতদাসত্ত্বেও ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব ছিলোনা এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। মুসলিম অপশক্তির সাথে বিরোধিতা ও জিহাদের মাধ্যমে সশস্ত্রভাবে তাদের দম্ভ চূর্ণ করা এবং রাষ্ট্রের অভ্যান্তরে ইসলামি সভ্যতা সংস্কৃতি ও শরীয়ার বাস্তবায়ন কমবেশি হতেই ছিলো। যদিও 'নিজ স্বার্থে ক্ষমতার ব্যবহার' না করার খোলাফায়ে রাশেদীনের সে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেভাবে আর পাওয়া যায়নি।

[৪] খিলাফত ও আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাঝে মৌলিক পার্থক্য:

উপরের আলোচনার পর এখন খিলাফত ও বর্তমান আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী তা নিয়ে কিছু আলোকপাত করা দরকার মনে হচ্ছে, যাতে এই কথা স্পষ্ট হয় যে বর্তমান রাষ্ট্রসমূহ খিলাফতের সাথে নূন্যতম কোনো মিল তো দূরের কোথা, উসমানী বা মুঘোলদের সাথে তার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। নিম্নে বর্ণিত পার্থক্যগুলো যদিও বিস্তারিত বলার দাবী রাখে কিন্তু সংক্ষিপ্ততার জন্য অল্পকথায় উপস্থাপন করছি।

প্রথম: জাতীয়তাবাদী ইসলামী রাষ্ট্র

খিলাফত ও বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রথম মৌলিক পার্থক্য হলো, বর্তমানের সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে জাতীয়তাবাদের আলোকে গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ পূর্বের কোনো যুগে এর অস্থিত্ব ছিলোনা। জাতীয়তাবাদ বলা হয়, একটি নির্দিষ্ট ভুখণ্ডের সীমারেখা দিয়ে সে হিসেবে ব্যক্তির পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ। যেমন পাকিস্তানী আফগানী বাংলাদেশী ইত্যাদি। আর এই ভিসা এম্বাসি এগুলো হলো, জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের ফলাফল। জাতীয়তাবাদের মৌলিক কিছু গুণাবলি আছে। ক. জাতীয়তাবাদ মূলত মানুষের মাঝে পরস্পরে ঘৃণার সৃষ্টি করে। নিজ জাতি ছাড়া অন্যজাতিকে সর্বদা প্রতিপক্ষ ভাবাতে শিখায়। খ. ভালো-মন্দের হিসাব নিজস্ব জাতীর বিবেচনায় করা হয়। যেকোনো ভালো-মন্দ বা যেকোনো স্বার্থে প্রথমে নির্দিষ্ট সে ভুখণ্ডের জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। যেমন, আফগানে যখন আমেরিকা আক্রমণ করে তখন পাকিস্তানে এই শ্লোগান তোলা হয়েছিলো ‘পাকিস্তানের স্বার্থই সর্বপ্রথম’। গ. মানুষকে স্বার্থপরী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলে। যত ধরনের অর্থনৈথিক, সামরিক উন্নতি ও অগ্রগতি আছে সবকিছুই হবে শুধু ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও তার মানুষের জন্য। এই অর্থে পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদ একই ফলাফলে পৌঁছে। তা হলো, ব্যক্তি স্বাধীনতা। একটিতে ব্যক্তিকে অফুরন্ত সম্পদ, শক্তি ও নফসের পুঁজার জন্য তৈরি করা হয় আর অন্যটিতে জাতিকে তৈরি করা হয়। (এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয়তাবাদ মূলত পুঁজিবাদের একটি সামর্থক বিষয়।) ঘ. জাতীয়তাবাদে জাতির জন্য অর্থনৈথিক উন্নতি ও দুনিয়ার খুশি-তামাশা ছাড়া ব্যক্তি জীবনে উন্নতির আর কোনো লক্ষ্য দেওয়া হয়না। পুঁজিবাদই এখানে জীবনের ‘কল্ল্যাণের’ একমাত্র লক্ষ্য। একজন পুঁজিবাদি নিজেও এই জীবন গ্রহণ করে এবং অন্যরাও যাতে জীবনের লক্ষ্যতা নির্ধারণ করে তার পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেয়। ঙ. জাতীয়তাবাদ মানুষকে উপনিবেশবাদের মানসিকতায় বেড়ে উঠায়। তা মানুষকে একটিই লক্ষ্য দেয় তা হলো, জাতীর স্বার্থ এবং নিজ জাতি অন্য

জাতীর উপর বিজয়ী হবে, অন্য সমস্ত জাতি তার জাতির অধিনস্তে থাকবে। আর এই জন্য অন্য জাতী গোষ্ঠীকে অধিনস্ত করে এমন প্রত্যেক কাজকে ‘ভালো’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

জাতীয়তাবাদের এই চেতনা ইসলামের মৌলিক আদর্শের সাথে পূর্ণ বিপরীত। ইসলামে ভুখণ্ডভিত্তিক স্বার্থপরতার কোনো স্থান নেই। বরং মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে সে অন্য জাতীর উপকারে আসে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে”। (সুরা আলে ইমরান : ১১০)

অর্থাৎ মুসলিম জাতীর জীবনের অন্যতম প্রধাণ মাকসাদ হলো, মানুষের সংশোধন করা। ‘এক উম্মাহ’ দর্শণের দুটো দিক। এক হলো, উম্মাতে দাওয়াত আরেক হলো, উম্মাতে ইজাবাত। কাফেরদের সাথে মুসলিম জাতীর সম্পর্ক ঘৃণার বা বিদ্বেষের নয় বরং দাওয়াত ও সংশোধনের। কাফেরদের সাথে যখন যুদ্ধের সম্পর্ক তৈরি হয় তখন তা এই জন্য নয় যে, কাফেররা আমাদের থেকে সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে অগ্রগামী হয়ে গেছে। মুসলিমদের যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্যই হলো, সত্যের সে আহবান কবুল করে তা দুনিয়ার ছড়িয়ে দেওয়ার মহান কাজে তারাও অংশীদার হোক, যা একজন মানুষের জন্য তার স্রষ্টা আল্লাহ পছন্দ করেছেন। ‘জাতীয়তাবাদ’ আর ‘উম্মাহ’ এই দুই দর্শণ কখনো একই সাথে সঠিক হতে পারে না। কারণ তা একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত

কনসেপ্ট। জাতীয়তবাদের দর্শণ প্রতিষ্ঠাই হয় ঘৃণার উপর আর 'উম্মাহ' এই দর্শণের মূলই হলো সম্পৃতি ও সহমর্মিতা।

পরারাষ্ট্রনীতিতে ইসলামের দর্শন উপনিবেশবাদ নয়, বরং জিহাদ। যেখানে সম্রাজ্য বিস্তারের অর্থ অন্যদের গোলাম বানানো নয়, বরং ইসলামের দাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করে অন্য জাতিগোষ্ঠীকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার চেষ্ঠা করা। ইসলামের খিলাফতের ইতিহাসে সর্বদা জিহাদ ছিলো। উসমানী ও মুঘল সম্রাজ্যেও পরারাষ্ট্রনীতি জিহাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো যেমন পূর্ব যুগে ছিলো। উসমানী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান খান ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সাত হাজাত বর্গমাইল নিয়ে উসমানী সম্রাজ্য শুরু করেছে যা সুলতান মুহাম্মত ফাতেহের আমলে ১৪৮১ হিজরীতে একলক্ষ্য বর্গ কিলোমিটার অতিক্রম করে ফেলে। তবে এই কথা সত্য যে, উসমানীরা শেষ যুগে ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তারে মুসলিমদের সোনালী ইতিহাস ও সভ্যতা থেকে দূরে সরে গেছে। এবং এটাই ইসলামি খিলাফত পতনের অন্যতম কারণ। কারণ, এতে অমুসলিমদের ইসলামের অন্তর্ভুক্তি কমে গেছে যার ফলস্রুতিতে ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও সভ্যতা মানুষের কাছে অপরিচিত হতে থাকে। এমনকি মুসলিমরাই নিজেদের সভ্যতা ও বিধানকে কঠোর ভাবতে শুরু করলো এবং তার ধ্বংসে খুশী হতে লাগলো।

দ্বিতীয়: রাসুলের প্রতিনিধি হিসেবে নয় জনগনের প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা

গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ জনগনকে নাগরীক কারো দ্বারা শাসিত (citizens) না হয়ে শাসক (autonomous) হিসেবে ধরা হয়। রাষ্ট্র এই জনগনের সকল চিন্তা ও চাহিদার বাস্তাবায়নের কাজ করে যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালকগণ জনগনের প্রতিনিধি হয় (representatives), যাদের কাজ হলো, মানুষকে এই

বিশ্বাস দেওয়া যে, তাদের সকল চাহিদা রাষ্ট্রে পুরণ করা হবে এবং জনগনের আনন্দ-উপভোগ ও চাহিদা পূরণের যথাসম্ভব ব্যবস্থপনা করে দেওয়া হবে। এটাই জনগনের প্রতিনিধি গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাস্তবতা যেখানে মানুষ্য চাহিদা অর্জনই হলো জনগনের সাথে শাসকের একমাত্র অঙ্গীকার ও তাদের পরস্পরের সম্পর্ক। আর যে শাসক তা যত বেশি পূরণ করতে পারবে তার গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি হবে এবং তাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য সাহায্য করা হবে। আর যারা জনগনের ‘চাহিদার’ যোগানের থলি ভরতে পারবে না, তাদের অনুসরণ যোগ্যই মনে করা হবেনা। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুরো দর্শন এই ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সকল প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহ এই বিশ্বাসকেই দৃঢ় করার জন্য কাজ করে যায়। গনতন্ত্রের সারমর্মই হলো, ‘সকল সিদ্ধান্ত জনগনের চাহিদা ও ইচ্ছার অনুকুলে হতে হবে’। আর তার ফলাফল হলো, সকল ভালো—মন্দ নির্ধারণ করার মাপকাটি হলো জনগনের মন-চাহিদা। অপরদিকে ইসলামি রাষ্ট্রে জনগন হলো প্রজা (رعاية) আর শাসক জনগনের নয় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। যার কাজ মানুষের চাহিদার পূরণ করা নয় বরং মানুষের চাহিদা যেনো শরীয়তের অনুগামি হয় সে মানসিকতা তৈরি করা। এই অর্থে যে রাষ্ট্র যত বেশি গনতান্ত্রিক সে রাষ্ট্র ততবেশি অনৈসলামিক।

ভোটকে কেউ কেউ বাইয়াতের বিকল্প মনে করে থাকে, অথচ ভোট পরিপূর্ণ বাইয়াতের বিপরীত। বাইয়াতের অর্থ হলো, হেদায়েতের উদ্দেশ্যে কোনো মহান ব্যক্তির হাতে নিজের সত্ত্বাকে অর্পণ করা। আর ভোট হলো, জনগন নিজের স্বাধীনতার ক্ষমতাকে তার রক্ষা করার শর্তে কিছু মানুষের হাতে অর্পন করা। এই অর্থই জনগন হলো সকল ক্ষমতার উৎস। ইসলামে ভালো-মন্দ নির্ণয়ে জনসাধারণের ইচ্ছা বা আধিক্যের কোনো স্থান নেই বা ধারণাই নেই। ইসলামি খিলাফতে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৌলিকনীতি হলো, কোনো বিধান

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছের অর্জন করার চেষ্টা করা। আর এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টি কী তা শুধু কুরআন সুন্নাহের ইলম রাখে এমন আলেমগণই বুঝতে সক্ষম। 'শাসক জনগণের প্রতিনিধি' রাষ্ট্র পরিচালনার এমন কোনো দর্শন খিলাফায়ে রাশেদিন থেকে নিয়ে ইসলামের পুরো ইতিহাসে কখনোই ছিলোনা। এমনকি ইসলামি জ্ঞানের কোনো শাখায় এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। জনগনের শাসন ও শাসক জনগনের প্রতিনিধি এই দর্শন জঘন্যতম একটি বেদআত।

তৃতীয়: উলুমে ইসলামিয়াকে বাদ দিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রে শিক্ষানীতি বানানো

বর্তমান পৃথিবীতে একটি রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা বুঝার অন্যতম মাধ্যম হলো সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কাঠামো কী তা জানা। কারণ শিক্ষাব্যবস্থাই একটি রাষ্ট্র কী ধরনের নাগরিক চায় তা তৈরি করার কারখান। যদি মুসলমানরা কখনো শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতেও পারে, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ততক্ষণ স্বপ্নই রয়ে যাবে যতক্ষণ না সমাজে ইসলামি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা হবে। কারণ শিক্ষানীতি থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার পলিসি ও তার বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য লোক তৈরি হয়।

প্রতিটি শিক্ষানীতি সমাজে তিনটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে প্রণয়ন করা হয়। ১. রাষ্ট্রের ঐ সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যা অর্জন করা ছাড়া সে রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম নয়। ২. রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিককে জীবনের নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য দিবে ও নাগরীকরা সে উদ্দেশ্য তার জীবনের জন্য গ্রহণ করে পরস্পর কীভাবে সমাজে চলতে পারবে, শিক্ষানীতি রাষ্ট্রের নির্ধারন করা সে উদ্দেশ্য নাগরিকদের

প্রধান করে। ৩. পরষ্পরের সম্পর্কের ভিত্তিতে সে সমাজ আর রাষ্ট্র গঠিত হয় সে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা ও তা দূরীকরণে যে পলিসি নির্ধারণ করা হয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে সে পলিসির জন্য উপযোগী যোগ্য লোক তৈরি করা।

সুতরাং কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র তখনই ইসলামি হতে পারবে যখন তার শিক্ষানীতি ইসলামি হবে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বা পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানে নয়। কারণ যখন শিক্ষানীতিতে ইসলামের আধিক্য না হবে তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের যেকোনো পলিসি ইসলামের অনুযায়ী করা সম্ভব হবেনা।

ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্র হলো কুরআন-হাদিস ও তার থেকে জ্ঞান আরোহনের মূলনীতিসমূহ অর্জণে শাস্ত্রসমূহ এবং ইলমে কালাম ও তাসাউফের সংকলিতরূপ। তার মধ্যে একটি হলো ফিকহ ও উসুলে ফিকহ। তা অর্জনের উদ্দেশ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহ থেকে এমন কোনো মূলনীতি বের করা যার আলোকে মানুষের জীবনের সকল কাজ কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তার সঠিক পদ্ধতি নির্ণয় করা। বিপরীত দিকে পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানের পরিনাম হলো পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। পুঁজিবাদের বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সকল পলিসি নির্ধারণ করা ও রাষ্ট্রের সংবিধান সেনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা। পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞান একদিকে পুঁজিবাদি সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগঠনের তত্ত্ব সামনে আনে। অন্যদিকে জনগনের মাঝে স্বাধীন ইচ্ছে শক্তির এমন সব মৌলিক ভিত গড়ে তুলে যাতে অটোমেটিক রাষ্ট্র ও সমাজ পুঁজিবাদে গঠিত হয়ে যায়। এক কথায় পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে হলো সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন এক নতুন সংবিধান, রীতি-নীতি প্রণয়ন ও এমন রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা যার সাথে আসমানি ওহির কোনো সম্পর্ক নেই।

এই দৃষ্টিতে যদি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র আর ইসলামি রাষ্ট্রনীতি তুলনা করা হয় তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে চৌদ্দশত বছরে যে জ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাব ছিলো তা

ছিলো ইসলামি জ্ঞান শাস্ত্রের। যার বর্তমান রূপ হলো উপমহাদেশের দরসে নেজামি।

আমাদের ইতিহাসে ইসলামি জ্ঞান শাস্ত্রের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় পলিসি প্রণয়ণ করা হতো। হ্যাঁ, কখনো শাসকরা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের জন্যেও অনেক পলিসি প্রণয়ন করতো। বর্তমান জামানায় যেমন রাষ্ট্রীয় যেকোনো পলিসি সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে বিশেষ করে পুঁজিবাদের আলোকে গঠন করা হয় আর শাসকরা এই সমস্ত পলিসি আর নিয়মের ভিতরে থেকেই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে।

আজ এই কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যত দ্রুত পশ্চিমা সাইন্সে অগ্রগতি হচ্ছে ততটাই দ্রুত ইসলামি জ্ঞান শাস্ত্র মানুষের কাছে অহেতুক মনে হচ্ছে। আধুনিক সাইন্সের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের সীমাহীন চাহিদাকে দুনিয়াতে পূর্ণ করার কর্তৃত্ব তার হাতের মুঠোয় এনে দেওয়া। আধুনিক সাইন্স অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি জীবনের উদ্দেশ্য নয় বরং দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় এনে নিজের চাহিদা ও ইচ্ছা শক্তিকে সকলকিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত করা। আধুনিক বিজ্ঞান এরকম জাহেলি চিন্তা আর পাগলামিকে আরো উস্কে দেয় যে, মানুষ তার আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে সকল গোপন রহস্য উন্মোচন করে নিজেকে ছাড়া সকল প্রকার শক্তির অধীনস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। এক কথায় মানুষ নিজেই নিজের খোদায় পরিনত হতে পারবে এই বিশ্বাস তার মাঝে তৈরি করা।

এই শিক্ষানীতি ঐসকল মানুষকেও সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত, সম্মানি ও জ্ঞানী ব্যক্তি করে তুলে, যারা নবিদের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে যদিও সে বিভিন্ন ঘৃণিত স্বভাবের অধিকারীও হয়না কেন! এই শিক্ষানীতিই রাষ্ট্রে সকল রীতি-নীতি তৈরিতে ভুমিকা রাখে যার পুরো ভিত্তি হয়

মানুষের কামনা-বাসনা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি নয়। যেহেতু বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এই জাহিলি শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত, তাই কোনোভাবেই ইসলামি খিলাফাহ বা রাষ্ট্রের সাথে তার কোনো মিল নেই। উল্টো সমাজে যতই এই শিক্ষানীতি মজবুত হচ্ছে ততই উপনিবেশবাদ ও তাগুতি সিস্টেম মুসলিম রাষ্ট্রকে গ্রাস করে ফেলার কাজে সহযোগিতা করছে।

চতুর্থ: শরীয়া আইনের বিপরীত হিউম্যান রাইটসকে (মানবতাবাদ) রাষ্ট্রের সংবিধান বানাবো

আমাদের রাষ্ট্রসমূহের সকল আইন-কানুন প্রণয়ন হয় সংবিধান অনুযায়ী। আর এই সংবিধান আল্লাহর হাকিমিয়্যার বিপরীত মানুষের হাকিমিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা করে। আর তা প্রণয়ন করা হয়েছে শরীয়ত বাস্তবায়নের সকল সম্ভাব্য পথ বন্ধ করে দিয়ে। কারণ সংবিধানের মর্যাদা গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঐ পরিমান, যেমন একটি শরীয়া রাষ্ট্রে আসমানী গ্রন্থ কুরআনের যে মর্যাদা। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রর সংবিধানের যেকোনো আইন প্রণয়নের ভিত্তি হলো হিউম্যান রাইটস। পৃথিবীর কোনো গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন যদি হিউম্যান রাইটসের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে তা আইনীভাবে অগ্রহনযোগ্য বলে ধর্তব্য হয়, যেমন ইসলামি খিলাফাহ ব্যবস্থায় কোনো আইন যদি কুরআন-সুন্নাহের বিপরীত হয়। হিউম্যান রাইটসের খোলাসা কথাই হলো, রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার স্বাধীন ইচ্ছেমতো যেকোনো কাজ করতে পারার অধিকার দেওয়া। আর এই আইন দুটো উদ্দেশ্য সামনে রেখে তৈরি করা হয়।

এক. প্রত্যেক ব্যক্তির যা চাইবে সে চাওয়ার অধিকার তার থাকবে এবং তা অর্জন করতে পারবে, যতক্ষণ না তা অন্যের স্বাধীনতার মাঝে বিগ্নতা সৃষ্টি না করে। যেমন ধরে নিন, এক ব্যক্তি মদ পান করতে চায়। এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে যদি সকল মানুষ মদ পান করতে চায় তাহলে কি সকলের জন্য এভাবে মদের

অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে? যেহেতু সকল মানুষকে মদ পানের অনুমতি দিলে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় কোনো বিগ্নতা আসেনা সেহেতু হিউম্যান রাইটসের উপর প্রতিষ্ঠিত গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মদ পান করা কোনো গর্হিত কাজ নয়। কিন্তু বিপরীত কোনো মানুষ যদি মদ পান করে গাড়ি চালাতে চায় তাহলে তাহলে তার এই কাজ অন্যায় হিসেবে ধর্তব্য হবে। কারণ সকল মানুষকে যদি এই কাজের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে কেউ গাড়ি চালাতে পারবেনা। কারণ তাতে অন্যের ক্ষতি হবে। এই মূলনীতির কারণেই পরস্পরের সেচ্ছাসম্মতিতে ভাই বোনের সাথে বিবাহ করা, পিতা তার মেয়ের সাথে বা ছেলে তার মায়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করা কোনো গর্হিত কাজ নয়। কারণ যদি সকল মানুষ এই কাজ করে তাহলে অন্যের স্বাধীনতায় তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটবেনা। চরিত্রের এই মূলনীতিকে ক্যান্টের উদ্ভাবিত বৈশ্বিকনীতি (Principle of universalizability) বলা হয়। এই মূলনীতি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির আইনগতভাবে ঐকাজ ও ইচ্ছের বাস্তবায়ন করার অনুমতি আছে যা অন্যের স্বাধীনতার পথে বিঘ্নতা সৃষ্টিতে কোনো বাঁধা হবেনা।

দুই. প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন অধিকারকে এমনভাবে সাজানো যাতে সে তার স্বাধীনতাকে এমনভাবেই ব্যয় করতে বাধ্য হয় যার ফলে অন্যের স্বাধীনতায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করতে পারে। যেমন কোনো পিতা যদি তার মেয়েকে রাত্রে ইউনিভার্সিটির কোনো অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করে তাহলে মেয়ের এই অধিকার আছে, সে পুলিশ ঢেকে এনে আদলের সামনে শাস্তির জন্য সম্মুখীন করতে পারবে। তেমনি কোনো পিতা যদি তার সন্তানকে নামাজের জন্য বাধ্য করে তাহলে সন্তানের আইনত এই অধিকার রয়েছে যে, সে তার পিতাকে এজন্য পুলিশে দিতে পারবে।

হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান হওয়ার একমাত্র ভিত্তি হলো মানুষের খাহেশাত ও প্রতিটি আইন তৈরি করা হবে এই দর্শনকেই সামনে রেখে, যাতে প্রতিটি মানুষের আইনের মাধ্যমে বেশি থেকে বেশি নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে। বর্তমানের প্রায় অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের আইনের মূল ভিত্তিই হল এই হিউম্যান রাইটস। এবং বিশ্বের মোড়লদের কাছে শুধু সেই আইনই আইন হওয়ার উপযুক্ত যাতে হিউম্যান রাইটসকে ভিত্তি বানানো হয়েছে।

এই হলো একটি খিলাফাহ রাষ্ট্র তত্ত্ব ও আধুনিক রাষ্ট্র তত্ত্বের পার্থক্যের মৌলিক কিছু দিক। এছাড়াও আরো অসংখ্য মৌলিক পার্থক্য ও শাখাগত হাজারো পার্থক্য রয়েছে। একটি মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে, দুটো বস্তুর মৌলিক গঠণের মূলধাতুই যদি ভিন্ন হয় তাহলে বাহ্যত কিছু মিলের কারনে তা কখনই এক হয় না। একজন মানুষ আর একটি বানরের সৃষ্টির মূল ধাতুই ভিন্ন, এক মানুষের কিছু আচরণ যদি বানরের মাঝে পাওয়া যায় এতে যেমন বানরকে মানুষ বলা যায় না, তেমনি বানরের কিছু আচরণ মানুষের মাঝে পাওয়া যাওয়ার কারনে তাকেও বানর বলা হবে না। তেমনি ইসলামের কিছু শাখাগত বিষয় গণতন্ত্রের মাঝে পাওয়া গেলেই তা কখনোই ইসলামি হয়ে যাবে না। তেমনি ইসলামের কোনো সুন্দর কিছু গণতন্ত্রের মাঝে পাওয়া গেলে তাও গণতন্ত্র হয়ে যাবে না। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় হলো, কুকুর আর মানুষের কিছু বাহ্যত কিছু মিল দেখে কুকুর ও মানুষ মূলত একই বস্তু এই অসম্ভব এক সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে ইসলামি গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ! আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুক। ও এই চিন্তার মানুষ থেকে উম্মতে মুসলিমাকে হিফাজত করুক। আমীন